মমতা

"কিন্তু কেন স্বপ্নাদি? কেন?"

স্বপ্নাদি ঝাপসা গলায় বললো, "পুতুল, তুমি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। সব কথা তোমায় বলা যায় না, হয়তো বুঝবেও না তুমি। শুধু এটুকু জেনো যে সম্ভব নয় বলেই তোমার এই সামান্য অনুরোধটুকুও রাখতে পারলাম না। ডক্টর পেরেরার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো সত্যিই আমার পক্ষে সম্ভব নয় ----।"

আমার তাজ্জব বনে যাওয়া মুখে-চোখে জ্ঞানোদয়ের আলো ফোটে।

ভিতরের আড়ষ্টতা কাটানোর জন্যে জোর করে গলায় সপ্রতিভতা টেনে এনে বলি, "তাতে আর কি হয়েছে ! ঠিক আছে - ইয়ে - আমি মিসেস আগরওয়ালকে বলে দেবো তোমার সময় নেই। কিংবা তোমার শরীর ভাল নেই।"

স্বপ্নাদি সিগারেটে টান দিতে দিতে আধবোঁজা তন্ময় চোখে ঘূর্ণায়মান টেবিল ফ্যানটার দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আমায় দরজার দিকে এগোতে দেখে সিগারেট-বিহীন হাতটা নেড়ে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করলো। আমি সেই ইঙ্গিত অনুযায়ী ফিরে এসে ওর বাঁ পাশের চেয়ারটায় বসলাম। স্বপ্নাদি আবার ফ্যানের দিকে দৃষ্টি ফেরালো।

এই সুযোগে গোড়ার কথা কিছুটা বলে রাখি। আমি স্বপ্নাদির থেকে বয়সে কয়েক বছরের ছোট হলেও এবং আমার ডাক নাম পুতুল হলেও পাঠক যেন ভুল না বোঝেন। আমার পোষাকী নাম সুলতা চক্রবর্তী এবং আমার সহকর্মিণীরা আমায় প্রফেসার চক্রবর্তী বলে সম্বোধন করে (বয়সটা জানাতে একটু অসুবিধা আছে)। সংক্ষিপ্ত পৃষ্ঠভূমিটা এই রকম।

এম.এ. পাস করার পর বছর তিনেক অনেক ঘোরাঘুরি করেও কিছু

সুবিধে করতে পারিনি। এই ক'বছরে খবরের কাগজে কর্মখালি বিজ্ঞাপন দেখে এন্তার দরখাস্ত পাঠিয়েছি। অভিভাবকরাও সেই কাগজেরই অন্য কলমের বিজ্ঞাপন হাতড়ে চিঠি ঝেড়ে গেছেন অবিশ্রান্ত ভাবে। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছে, বেকারত্ব বা আইবুড়ো নাম, কোনটাই খণ্ডানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত নিরাশার পাথারে ডুবতে ডুবতে, ভেসে আসা গাছের গুঁড়ির মত যে আশ্রয়টিকে আঁকড়ে ধরে কোনমতে টিকে গেলাম, তা হল আমাদের মোতিপুরের মনসুখলাল মুকুন্দলাল মহিলা মহাবিদ্যালয়।

কলেজটা বছরখানেক হল ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এর পেছনে আমাদের শহরতলীর অনেকেরই চেষ্টা, উৎসাহ ও শুভেচ্ছা থাকলেও, মূল অবদান তেজারতি কারবারী শ্রী মহাবীরলাল আগরওয়াল'এর। আগরওয়ালজী এক কথায় - অর্থাৎ এক সর্তে - কিছু জমি ও নগদ দু'লাখ টাকা দিয়েছেন। সর্তটি হল, কলেজ তাঁর স্বর্গত পিতৃদেব মুকুন্দলালের নামে হবে। তাঁর এই সর্তে সবাই সানন্দে রাজী তো হলই, বরং ফাউ হিসেবে তাঁর ঠাকুর্দা মনসুখলালের নামটাও জুড়ে দিল।

মহা উৎসাহে কাজ শুরু হল। পুরো জমিটাকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেলা হল, যাতায়াতের জন্যে সামান্য একটু ফাঁক রেখে। লোহার খুঁটি পুতে তার উপরে বিরাট একটা সাইনবোর্ড লাগানো হল। তাতে বড় বড় হরফে তিন লাইন জুড়ে লেখা হল কলেজের নাম-ধাম। মাঠের মাঝখানে খানচারেক ঘর উঠলো, উপরে অ্যাসবেস্টসের চাল। সামনের টানা বারান্দায় চিক টাঙিয়ে সেখানেও গোটা দুয়েক ক্লাস ও অফিস ঘরের জায়গা হল। অবশ্য বিকেলে কলেজ বন্ধ হবার পর চেয়ার-টেবিল ফাইল-পত্তর সবকিছু ঘরে তুলে রাখতে হত রোজ, কারণ চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব এ তল্লাটে একটু বেশী। একটি ঝি, একজন চৌকিদার ও একটা জমাদার এবং লেকচারারদের নিয়ে সবসুদ্ধ আটজন কর্মচারী বহাল হল। প্রথম তিনজন ছাড়া বাদবাকী সব অনারারী, সামান্য কিছু হাতখরচ পায় শুধু। অধ্যাপিকারা সবাই স্থানীয়। অধিকাংশেরই বয়স হয়ে গেছে, এদিকে বিয়ে-থাওয়ার আশাও ক্ষীণ। শুধু শুধু বাড়ি বসে থাকার চেয়ে একটা কিছু করা ভাল - এই রকম একটা মনোভাব তাদের। অবশ্য মাইনে না পেলেও প্রাণ দিয়ে খাটে সবাই, কলেজের বাঁধাধরা সময়ের বাইরেও। কলেজটাই ওদের সব আশা সার্থকতার প্রতীক, এটা যদি ভাল ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, বেঁচে যাবে ওরাও। ফুলে

ফলে সমৃদ্ধ না হলেও খানিকটা সম্মান, খানিকটা সার্থকতা পাবে জীবনে।

তাই মনসুখলাল মুকুন্দলালের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখি আমরা। ছোট্ট শহরতলীর অ্যাসবেস্টসে ছাওয়া, প্রায় অজ্ঞাতনামা কলেজটার প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির জন্যে নানারকম পরিকল্পনা করি। আগামী সতেরই জুন প্রথম বার্ষিকী। এই উপলক্ষটিকে ঘিরে অনেক প্রস্তুতি চলছে। স্টল খোলা হবে কয়েকটা। এছাড়া খেলাধূলা, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, নাচ-গান-ড্রামা ইত্যাদি তো থাকবেই। একজন গণ্যমান্য অতিথি আসবেন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করতে। এ ব্যাপারে একটা অদ্ভুত যোগাযোগও ঘটে গেল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ডঃ পীটার পেরেরা পাটনায় এসেছেন একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে। প্রফেসার সিনহার (আমার বাল্যবন্ধু মুক্তা) কাকাও ওই কনফারেন্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনিই ডঃ পেরেরার নাম সাজেস্ট করলেন। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে মন্ত্রী, উপমন্ত্রীদের ডাকার রেওয়াজ হলেও সত্যি সত্যি তাঁদের বিদ্যে-বুদ্ধির দৌড় কদ্দূর, তা সবারই জানা। তার চেয়ে আমরা যদি ডঃ পেরেরার মত গুণী ব্যক্তিকে ডাকি, সেটা সবাই এ্যাপ্রিসিয়েট করবে। তাছাড়া বিহারের প্রতিটি কাগজে ফলাও করে বিবৃতি ছাপবে নিঃসন্দেহে।

আমরা এ প্রস্তাবে লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু ডক্টর পেরেরা কি আসবেন? এ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানোর সামিল ! মুক্তার কাকা কেদারবাবুই এ ভারটা নিলেন এবং যথাসময়ে এক মুখ হাসি নিয়ে সুখবরটা জানিয়ে গেলেন আমাদের। ডঃ পেরেরা সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন। ভাগ্যক্রমে কলেজ দিবসটা শনিবার পড়ছে। সেদিন কনফারেন্সের কাজ এমনিতেও বন্ধ। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী আরও কয়েকজন বিদেশী শিক্ষানবিস আসবেন ওঁর সঙ্গে। মফস্বল অঞ্চল দেখার উৎসাহ তাঁদেরও।

এই সূত্রেই আমার বড়মামার মেয়ে স্বপ্নাদির কথা মনে পড়ে গেল। ও শুধু আমার আত্মীয়াই নয়, মোতিপুরের মেয়েদের গর্ব ও প্রেরণা। ম্যাট্রিক থেকে আগাগোড়া বৃত্তি পেয়ে এসেছে। এম.এ.'তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তারপর কমনওয়েল্থ্ স্কলারশিপে অক্সফোর্ড থেকে ডক্টরেট পেয়ে দিল্লীর একটি সেরা সংস্থানে কাজ নিয়েছে। উপস্থিত পারিবারিক কারণে

ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে। কারণটা মিটে গেছে, আর ক'দিন পরেই দিল্লী ফিরে যাবে। স্বপ্নাদি বরাবরই আমাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখে। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও আমার সঙ্গে ব্যবহার করে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। আর আমি? আমার চোখে স্বপ্নাদির স্থান আকাশের চাঁদ-তারার পাশে। ছোটবেলাকার হিরো ওয়ারশিপটা পুরোপুরি বজায় আছে আজও।

স্বপ্নাদি যে ঠিক এই সময়টাতে মোতিপুরে আছে, এটাও ভাগ্যলক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন দাক্ষিণ্য বলে মনে হল আমাদের। মফঃস্বলের মেয়ে আমরা। হঠাৎ এক ঝাঁক মান্যগণ্য অতিথির আগমনের সম্ভাবনা কলেজের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির সুযোগ এনে দিলেও, বেশ খানিকটা ঘাবড়ে দিচ্ছিল আমাদের। আগরওয়ালজীর পুত্রবধূ কলেজের বেসরকারী হেড। ওঁকে স্বপ্নাদির কথা বলতেই যেন অকূলে কূল পেলেন ভদ্রমহিলা। আমাকে বিশেষ ভাবে চেপে ধরলেন। আর কিছু নয়, এই বাইরে থেকে আসা লোকেদের দেখাশোনার ভারটা যেন নেন স্বপ্নাদি। খাটা-খাটুনি জোগাড়-যন্তর, এ সবের ত্রুটি রাখবো না আমরা। স্বপ্নাদিকে শুধু প্রধান হোস্টেসের ভূমিকাটি নিতে হবে। মিসেস আগরওয়ালকে অভয় দান করে স্বপ্নাদির বাসস্থানে হাজির হলাম।

ডক্টর পেরেরার নাম করতেই বলে উঠলো, "ও পীটার? সে তো এখন হার্বাডে পড়ায় শুনেছি। পেপারে দেখলাম ইণ্ডিয়াতে এসেছে ক'দিনের জন্যে।"

জিজ্ঞেস করলাম, "চেনো নাকি ওঁকে?"

"খুব ভাল করে। অক্সফোর্ডে ও আমার সমসাময়িক ছিল। ওর ফিঁয়াসে রুক্মিণী আমার পাশের ঘরে থাকতো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি ওদের।"

আমি উৎফুল্ল হয়ে আমাদের কলেজের তরফ থেকে প্রস্তাব পেশ করলাম। হঠাৎ কেমন মিইয়ে গেল স্বপ্নাদি।

নিস্তেজ গলায় বললো, "তা হয় না পুতুল।"

চুপচাপ ওর পাশে বসে রয়েছি। আর স্বপ্নাদি অর্ধনিমীলিত নেত্রে ইজি-চেয়ারে মাথা কাত করে শুয়ে আছে নীল রঙের জীন্‌স্ পরা পা

দুটো টোবিলের উপর তুলে। হঠাৎ নড়ে-চড়ে বসলো। ছোট হয়ে আসা সিগারেটটা এ্যাশট্রের উপর টিপে নেভাল।

তারপর সোজা হয়ে বসে আমার দিকে চাইলো সোজাসুজি, "জানো পুতুল, আমি চাই না তুমি কোন ভুল ধারণা নিয়ে থাকো। তোমাকে ঘটনাটা বলছি সেই জন্যেই, যদিও প্রকৃত ঘটনাটা কি, তা আমি নিজেই জানি না। আসলে একে ঘটনা বলা যায় কিনা তাও জানি না আমি। হয়তো সবটাই শুধু ধারণা এবং সে ধারণাটা ঠিক কি ভুল তাই বা কে বলতে পারে? তবু তোমাকে বলছি শোনো।

"আমি যখন ইউ.কে. যাই তখন স্কুলে পড় তুমি। বম্বে থেকে জাহাজ ধরলাম, পি.এ্যাণ্ড.ও.'এর স্ট্র্যাথমোর। জাহাজটা অস্ট্রেলিয়া হয়ে আসছিল। যাত্রীরা অধিকাংশই অস্ট্রেলিয়ান। একদল সিলোনিজও ছিল। এ ছাড়া প্রচুর ভারতীয় উঠলো বম্বে থেকে। এর আগে আমার সারা জীবন কেটেছে এই মোতিপুরে, আর তখনকার মোতিপুর এখনকার তুলনায় বলতে গেলে গণ্ডগ্রাম। তখন অন্য দেশগুলো আমার কাছে ছিল শুধু বইয়ের পাতায় পড়া কতগুলো ছাপা অক্ষর এবং ম্যাপে আঁকা ছবি। সেখানকার লোকজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এই প্রথম।

"প্রথম দেখায় যা হয় - ধাঁ করে একটা ইম্প্রেশন তৈরী হয়ে যায় মনের মধ্যে। ক্রমশঃ নতুন অভিজ্ঞতার আলোয় খানিকটা বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, কেটে-ছেঁটে এ্যাডজাস্ট করতে থাকি সেটা, তবু প্রথম ইম্প্রেশনটা পুরোপুরি যায় না। জাহাজে অস্ট্রেলিয়ান যাত্রীদের কেমন একটা রুক্ষ কাঠ-কাঠ মেজাজী হাব-ভাব। পরে অবশ্য ভদ্র, অমায়িক অস্ট্রেলিয়ান কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে, কিন্তু কেন জানি সেই প্রথম দেখা লোকগুলোকেই বেশী করে মনে আছে। সিলোনের দলটার সম্বন্ধে ধারণা হল সম্পূর্ণ বিপরীত। সবসুদ্ধু জন পনেরো ছিল ওরা, অধিকাংশই ছাত্র। ভদ্র, নম্র, একটু বুঝি ভাবপ্রবণ ও বেশ কিছুটা আদর্শবাদী। কেমন একটা নরম, শান্ত হাব-ভাব। যেন ছায়াঘেরা দ্বীপটার ভিজে মাটির স্নিগ্ধতা এবং চারিপাশের সমুদ্রের গভীরতা প্রতিচ্ছবি ফেলেছে দ্বীপবাসীদের আকৃতি-প্রকৃতিতে। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, ওদেশের কত লোককে দেখলাম। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে ধারণাটা পাল্টায়নি আজও।

"হ্যাঁ, যা বলতে যাচ্ছিলাম। জাহাজে থাকতেই খবর এলো সিলোনের প্রধান মন্ত্রী বন্দরনায়েক নিহত হয়েছেন আততায়ীর হাতে। এই সূত্রে সিলোনের দলটির সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় যাত্রীদের আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হল। শুনলাম ওদের মধ্যে তিনজনের গন্তব্যস্থল আমারই মত, অক্সফোর্ড। পৌঢ় অধ্যাপক ডক্টর ফ্রান্সিস্ ভিজার্ দু'বছরের জন্যে ওখানকার নাফিল্ড কলেজে ফেলোশিপ পেয়েছেন। বাকী দু'জনের মধ্যে ভেলুদায়েন হল বিজ্ঞানের ছাত্র, পীটার পেরেরা ইতিহাসের।

"অক্সফোর্ডে পৌঁছেও ওদের সঙ্গে দেখা হত মাঝে মাঝে। তিনজনে আমার হস্টেলে এসে হাজির হত এক এক দিন। ওদের নাকি মোটেই ভাল লাগছে না। ইংরেজ পুরুষগুলো নাকি মিশুক নয় মোটেই। তাদের নিখুঁত নৈর্ব্যক্তিক হিমশীতল ব্যবহারে এ তরফের বন্ধুত্বের স্বতঃস্ফূর্ত সব চেষ্টাই জমে বরফ হয়ে যায় মুহূর্তে।

"আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু একেবারে বিপরীত। হস্টেলে পৌঁছতেই এক ঝাঁক হাসিমুখ ঘিরে ধরলো চারিদিক থেকে। সঙ্গে করে যা কিছু দর্শনীয় দেখাতে নিয়ে গেল দল বেঁধে। থিয়েটার, পান্টিং, লাইব্রেরী, রেষ্টুরেন্ট, সুইমিংপুল - ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে নানা প্রোগ্রামে বোঝাই করা দিনগুলো অজানা ঐশ্বর্যে ভরে উঠলো। পরে অবশ্য জেনেছিলাম এ সবই পূর্ব-পরিকল্পিত। বিদেশী ছাত্রীদের দেখাশোনার ও তাদের একাকীত্ব লাঘবের জন্যে প্রতি বছর সেশন শুরু হবার আগেই পুরোনো ছাত্রীদের এক একটা দলের হাতে এক একজনের ভার দেওয়া হয়। কিশোরী হস্টেসরা নবাগতার সুখ, সুবিধের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে, বন্ধুত্ব ও প্রীতি দিয়ে ঘিরে রাখে তাকে। তারপর মেয়েটি যখন নতুন পরিবেশে খানিকটা মানিয়ে নিয়েছে, দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব পেয়ে গেছে, তখন একটু একটু করে দূরে সরে যায় ওরা। এই দ্বিতীয় ধাপের বন্ধুত্বটা পাকা। কর্তব্যবোধের খাতিরে নয়, সত্যিকারের ভালো লাগার উপর ভিত্তি এর।

"দ্বিতীয় বছরে হস্টেল ছেড়ে ডিগ্‌সে আশ্রয় নিলাম। খরচ কমবে খানিকটা। পোস্টগ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা বাইরেই থাকে সবাই, নেহাৎ বিদেশী মেয়েদের সুবিধের জন্যে প্রথম বছরটা হস্টেলে থাকতে দেয় তাদের। ডিগ্‌স বলতে আমার জুটলো মিসেস টমসন নামে মাথায় ছিটগ্রস্ত এক

বুড়ির বাড়ির তেতলার ঘরখানা।

"ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে রুক্মিণী অমৃতলিঙ্গমের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জাফনা থেকে এসেছে, সিংহলী তামিল। ভারী গম্ভীর প্রকৃতির মেয়েটি এবং বেশ একটু সেকেলে মতন। এ দেশের সব কিছু যাচাই করে ওদের গ্রামের মাপকাঠিতে এবং এদের তথাকথিত নির্লজ্জতা ও নৈতিক অধঃপতনে লজ্জা ও ঘেন্নায় সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে যায় ভিতরে ভিতরে। আমার থেকে বছর দুয়েক আগে এসেছে। শুরু থেকেই ডিগ্‌সে থাকার দরুন কিংবা এরকম গোড়ামীর জন্যে অথবা ওর মুখচোরা স্বভাবের জন্যেই, বলতে পারি না, বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়।

"একই লাইব্রেরিতে একই টেবিলে বসে পড়াশোনা করি, কাজেই আলাপ এবং খানিকটা ঘনিষ্ঠতা অবধারিত। সংস্কৃতের ছাত্রী। বললো, ওর আজীবনের স্বপ্ন নাকি ভারতবর্ষে গিয়ে ওখানকার বিখ্যাত মন্দিরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা। আমার অনেক কিছুই মেনে নিতে বাধতো ওর। আমি সিগারেট ধরেছি, মেয়ে-পুরুষ বাছবিচার না করে সবার সঙ্গে ভাব জমাই, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে অচেনা আধচেনা দলে ভিড়ে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি - এসব নিয়ে ওর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। ওর সমালোচনা শুনে হাসতাম শুধু।

ও হতাশ হয়ে বলতো, 'তুমি ঠিক আমার ছোট বোন মৈথিলির মত। তেমনি অবুঝ আর বেপরোয়া। তারই মত তোমার মনটাও এঞ্জেলের মত পবিত্র, বাইরের কলুষতা ছাপ ফেলতে পারে না। কিন্তু স্বপ্না, মনের দিক থেকে নিরাপদ হলেই হল না, শারীরিক নিরাপত্তাটাও ফ্যালনা নয়। আগেকার দিনে ভগবান রক্ষা করতেন। দুর্বৃত্ত রাবণ সীতার পবিত্রতা এতটুকু ক্ষুন্ন করতে পারেনি, কিন্তু আজকাল আর তেজ-টেজ কাজ করে না তেমন।'

হেসে বলতাম, 'সীতার তো চাকরি খোয়ানোর ভয় ছিল। অমন সতী- সাধ্বীর পদটা হাতছাড়া হলে কি নিয়ে থাকতো বেচারী? আমি হলাম মুক্ত বিহঙ্গ, নিজেই নিজের মালিক। আমার জন্যে চিন্তার কারণ দেখি না।'

"এ সব বেশ কিছুদিন পরের কথা। ওর কাছ থেকেই মিসেস

টমসনের তেতলার কুঠরীটার সন্ধান পেলাম। দোতলায় তার ঠিক নীচের ঘরখানার বাসিন্দা রুক্মিণী। ওর আগ্রহ ও উৎসাহেই ওখানে বাসসংস্থান হল আমার। জানি না রুক্মিণীর কোন গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল কিনা। আমাকে ওর পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে ওর কল্পিত বিপদ-আপদগুলো থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল হয়তো, কিংবা মিসেস টমসনের সেই বিড়াল অধ্যুষিত সঙ্গীবিহীন নিরানন্দ পুরীর বদ্ধ আবহাওয়ায় খানিকটা বৈচিত্র, খানিকটা উত্তাপ আনতে চেয়েছিল সদ্য পরিচিত দূর বাংলার বেহিসেবী মেয়েটিকে কাছে টেনে, যে বারে বারে তার বহুদিন না দেখা ছোট বোনটিকে মনে পড়িয়ে দেয়।

"এরপর শুরু হল সহ-অবস্থানের পাঠ। ওর প্রতিনিয়ত আমায় লক্ষ্য করে নানা উপদেশ ও সদ্ উদাহরণ দানের চেষ্টা - সব কিছুই ড্রেনের জলে ভেসে যেতো। আমার বল্গাছাড়া জীবন ওর চোখে যেমন অসহ্য লাগতো, আমিও করুণা করতাম ওর হাজারটা বাধা নিষেধে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অপরিসর রুদ্ধ জগৎটাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এমন ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী তিক্ততাটা কেন জানি আমাদের মধ্যে আসেনি কোনদিন। হয়তো রুক্মিণীর স্নেহ-মমতা ভরা নরম মনটারই কৃতিত্ব এটা।

"ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের রিডিং রুমের নীচে বেসমেন্টে সারি সারি অনেকগুলো আলমারী ছিল। লোকসভার প্রসিডিংসের বাঁধানো ভল্যুমগুলো ওখানেই থাকতো, এই ধরণের অন্যান্য বই'এর সঙ্গে। রেগুলার স্টুডেন্টদের জন্যে কোন কড়াকড়ি ছিল না। ইচ্ছেমত বই বার করে রিডিংরুমে এনে কাজ করতাম। অবশ্য ঠিক ইচ্ছামত বলা যায় না। কারণ বেসমেন্ট যাওয়ার সরু সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা এমনিতেই আরামদায়ক নয়, ভারী ভারী বই হাতে করে তো নয়ই। গোটা চার পাঁচ ভল্যুম বয়ে আনতেই প্রাণ বেরিয়ে যেতো। বই খুঁজে কাজের জিনিস হয়তো বেরোতো সামান্যই। সেটুকু নোট করে নিয়ে আবার আরেক দফা পাড়ি দিতে হত আগের বইগুলো যথাস্থানে রেখে নতুন বইয়ের সন্ধানে। দেখলাম এতটা মেহনৎ পোষাবে না।

"বেসমেন্টে আলমারীর সারির ফাঁকে গোটা তিন চার টেবিল ও চেয়ার রাখা ছিল। ঠিক করলাম বারে বারে বই ঘাড়ে করে সিঁড়ি ভাঙার বদলে এইখানে বসেই ক'দিন কাজ করবো। অবশ্য জায়গাটা মোটেই

লেখাপড়া করার অনুকূল নয়। লাইট জ্বালিয়েও কেমন একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব। চারিদিকের দেয়ালগুলো যেন চিপে মারতে আসছে। যাহোক, ওসব ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে কাজে মন দিলাম। এদিকের টেবিলে একজন ইজিপ্সিয়ান ভদ্রলোক বইয়ের স্তূপের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখে মিশরীয় মমীর কথাই মনে পড়ে যায়, এমন নিস্পন্দ আবিষ্ট মুখাবয়ব। অন্যপাশের টেবিলে বসে আশ্চর্য সুন্দর চেহারার বাইশ তেইশ বছরের একটি ছেলে খাতায় ক্রমাগত ঘসঘস করে কি লিখছে আর খানিক পরে সেটা কেটে ফেলছে নির্মম হাতে। ছেলেটি ইজরেলী। শুনেছি সারা পৃথিবী ঝেঁটিয়ে ইহুদীরা গিয়ে উঠেছে পিতৃভূমি ইজরেলে। কে জানে এ ছেলেটির পূর্বপুরুষেরা গ্রীক কিনা !

"লাল মলাট বাঁধানো মোটা মোটা ভল্যুমের ডাঙ জমে গেছে পায়ের কাছে। মেটিরিয়াল খুব বেশী পাইনি সে তুলনায়। ভাগ্যিস এগুলো রিডিংরুমে নিয়ে যাওয়ার দুর্বুদ্ধি হয়নি তখন ! কুলিগিরিই সার হত, মজুরীতে পোষাতো না। হঠাৎ শাড়ির খস খস আওয়াজে মুখ তুলে দেখি রুক্মিণী টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কখন।

নীচু গলায় বললো, 'লাঞ্চ খেতে যাবে না?'

লাঞ্চ মানে চীজ স্যাণ্ডউইচ ও কয়েকটা ফ্রাঙ্ক ফার্টার। সঙ্গেই আছে, তবে খেতে হবে বাইরে গিয়ে। ঘড়ির দিকে তাকালাম। তারপর উঠে মাটির থেকে বইগুলো তুলে আলমারীতে সাজিয়ে রাখলাম দু'জনে মিলে। সিঁড়ির সুরঙ্গ বেয়ে প্রথমে উপরে এলাম, তারপর বাইরে।

রুক্মিণী এদিক ওদিক তাকিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'স্বপ্না, তুমি আজ নীচে বসে পড়ছিলে কেন?'

বললাম, 'সে তো নিজের চোখেই দেখলে। ওই ট্রাক বোঝাই বই উপরে তোলা কি চাট্টিখানি কথা? তাও যদি কাজের কাজ হত।'

"ও তবু খুঁত খুঁত করতে লাগলো। এমন কি বইগুলো রিডিংরুমে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে চাইলো। আমি রাজী হলাম না। ওগুলো থেকে যে রেটে মেটিরিয়াল বেরুচ্ছে, তাতে দু'তিন দিনে গোটা আলমারীটাই দেখা হয়ে যাবে। রিডিংরুমের আলো-বাতাসবহুল সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারবো আবার। এ ক'দিন না হয় গুহা-বাসিনী হয়েই রইলাম।

'কিন্তু জায়গাটা মোটেই সেফ নয়।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম ওর দিকে। প্রথমটায় আমারও মনে হয়েছিল সে কথা। মনে হয়েছিল, বোধহয় যথেষ্ট অক্সিজেন নেই ওখানকার বাতাসে, দম বন্ধ হয়ে মরে যাব যে কোন সময়ে। কিংবা চারিদিকের দেয়ালগুলো ক্রমশঃ কাছে সরে আসতে আসতে চিপে মারবে আমায়। লিফ্‌টে উঠলেও এমনি একটা অনুভূতি হয় মাঝে মাঝে। নিছক কল্পনা বলে ঝেড়ে ফেলি ভয়টা। কিন্তু রুক্মিণী ওসব কাল্পনিক দুর্যোগের কথা ভাবছে না। ওর ভয় আমার দু'পাশের টেবিলের দুই ভদ্রলোককে।

"আমি সশব্দে হেসে উঠে বললাম, 'প্রফেসার হাসেমীর সঙ্গে আলাপ হয়নি তোমার? দাঁড়াও আসছে সপ্তাহে কুইন এলিজাবেথ হাউসে ওঁর লেকচারে নিয়ে যাবো তোমায়। মিড্‌ল্ ইস্টের উপর উনি একেবারে অথরিটি, চলন্ত লাইব্রেরী একটা।'

রুক্মিণী একটু মিইয়ে গিয়ে বললো, 'কিন্তু ঐ ছোকরাটা?'

বললাম, 'ওর নাম টোনি রুবেন। ইজরেল থেকে এসেছে।'

তারপর রুক্মিণীকে ক্ষেপানোর জন্যে বললাম, 'এদিকে ইজিপ্ট, ওদিকে ইজরেল - সাপ আর নেউল, কাজেই বিপদের বাষ্প মাত্র নেই। এরপরও যদি কিছু ঘটে, সে আমার নিয়তি। জেনো তোমার বন্ধু শহীদ হয়েছে ফর এ গুড কজ। আমার প্রাণ-মানের আহুতি দিয়ে যদি অতবড় আরব-ইজরেল সমস্যাটার সমাধান হয়ে যায় তবে দুঃখ নয়, উৎসব কোরো তোমরা।'

"কিন্তু রুক্মিণীকে চিনতে পারিনি তখনো। এ বিষয়ে আর কিছু বললো না বটে, কিন্তু এরপর ওরও বেসমেন্টে বসে লেখাপড়া করার প্রয়োজন ঘটলো হঠাৎ এবং ঠিক সেই ক'টা দিন। তারপর আমার কাজ যেদিন শেষ হল, রুক্মিণীও অম্লানবদনে খাতা-পত্তরের সরঞ্জাম বোঝাই গণ্ডোলা ঝুড়িটা হাতে করে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এলো আমার পিছু পিছু।

"এমনি ভাবে আরও একটা বছর কেটে গেল। ট্রিনিটি টার্ম শেষ হয়েছে - নতুন টার্ম শুরু হতে মাস তিনেক দেরী। অবশ্য আমাদের ছুটি

নেই। রবিঠাকুরের 'ক্ষ্যাপা'র মত ক্রমাগত নুড়ি হাতড়ে বেড়াচ্ছি পরশ পাথরের সন্ধানে। দেশে যে সব বই-পত্তর রাস্তাঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে, হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি তারি খোঁজে হাজার মাইল দূরে। সে সব কথা এখন থাক। ইণ্ডিয়া হাউসের লাইব্রেরীতে ভারত সরকারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমার প্রয়োজনীয় কিছু মেটিরিয়ালের খোঁজ পেয়েছিলাম। এ ছাড়া ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও বইপত্তর আছে কিছু। ঠিক করলাম ছুটির তিনটে মাস লণ্ডনেই একটা সস্তা ঘর নিয়ে কাটিয়ে দেবো।

"লণ্ডন যাওয়ার আগের দিন। জিনিসপত্তর ঠিকঠাক করছি। আমার অনুপস্থিতিতে ঘরটার একজন অস্থায়ী ভাড়াটে জুটেছে আমার বন্ধুদের যৌথ চেষ্টায়। অর্থাৎ দু'জায়গায় ভাড়া দিতে হবে না আমায়। জিনিসপত্র কিছু কিছু রুক্মিণীর ঘরে চালান দিয়ে ওয়ার্ডরোব ও ড্রয়ারগুলো খালি করছি দু'জনে মিলে, এমন সময় ভিজার, ভেলুদায়েন, পেরেরা এই তিন মূর্তির আগমন। এবার অনেকদিন পরে এসেছে ওরা। আমার পুরুষ বন্ধুদের দেখলে কেমন কাঠ কাঠ অপ্রসন্ন মুখ করে তাকায় রুক্মিণী। ওর তো সে সবের বালাই নেই। একটা মজার কথা এই সূত্রে মনে পড়ে গেল, বলে নিই।

"চশমা পরা, সোনালী চুলওলা ফ্যাকাসে চেহারার একটি ছেলে রুক্মিণীর পাশের টেবিলে বসে পড়তো। পরে জেনেছিলাম ওর নাম রিচার্ড। এখানে মোটামুটি সবাই বেশ রেগুলার, কিন্তু ও যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। রোজ লাইব্রেরীতে দরজা খোলার মিনিট কয়েক আগে হাজিরা দেয়, লাইব্রেরী বন্ধ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। ওর টেবিলে বসলেই শোনা যায় থেকে থেকে বেহালার করুণ রাগিণীর মত খালি পেটের কোঁ কোঁ ডাক। আমার বন্ধু ডায়ানা বলেছিল এটাই আদি অক্সফোর্ড সিমফনি, এ নাকি অক্সফোর্ডের নিজস্ব সঙ্গীত। বিদ্যাদেবীর আরাধনায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা সব ভুলে গেছে এরা। তাই ছেলেগুলোর খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মেয়েদের প্রসাধনহীন মুখ।

"হঠাৎ একদিন ক্লোকরুমের কাছে রুক্মিণী ধরলো আমায়, 'এদিকে শোনো। দরকারী কথা আছে।'

ভাবলাম নির্ঘাত বেমক্কা কিছু উপদেশ শুনতে হবে এখনি। কাজেই

যখন শুনলাম ও-ই আমার উপদেশ অর্থাৎ পরামর্শ চায়, চমৎকৃত হলাম। শুনলাম রিচার্ড নাকি ওকে 'ডেটিং'এর চেষ্টা করছে বেশ কিছুদিন থেকে। তাজ্জব বনে গেলাম। ছেলেটিকে ক্রমশঃ টেবিল, আলমারীর মত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটের অঙ্গ বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম। গায়ের রঙ পুরোনো বইয়ের দাগধরা ফ্যাকাসে কাগজের মত। শুঁকে দেখিনি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর বেশী কাছে গেলেই ওর গায়েও পুরোনো বই-পত্তরের সোঁদা গন্ধ পাওয়া যাবে। এহেন রিচার্ডও শেষ পর্যন্ত ----।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তুমি কি বললে ওকে?'

'কি আর বলবো? পাখী ধরতে গিয়ে এলোপাতাড়ি ঝোপ পেটানো পছন্দ করি না আমি। সোজাসুজি বললাম - আমাদের দেশে বাপু ও সব চলে না। পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঘোরাঘুরি মোটেই পছন্দ করে না আমার বাবা-মা।'

রুক্মিণী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশভূষা ঠিকঠাক করে রিডিংরুমে ফিরে গেল। এরপর থেকে রিচার্ড ছেলেটাকে দেখলেই কেন জানি ভারি অপ্রস্তুত হতাম আমি।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওদের দেখে রুক্মিণী মুখে চোখে হিমের প্রলেপ বুলিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এক পাশে।

অবাক হয়ে বললাম, 'ওদের এর আগে দেখোনি কোথাও? আশ্চর্য, দু'বছর হয়ে গেছে ! অক্সফোর্ডে সিলোনীজ ছাত্রদের তো আঙুলে গোনা যায়।'

পরিচয় হতে ওরা খুব খুশি হল। রুক্মিণীও দেশের লোক দেখে খানিকটা গললো মনে হল। খানিক আড্ডার পর ও আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করলো ওর রুমে ডিনার খেতে। অবশ্য সেটা ওদের খাতিরে কি আমায় দায়মুক্ত করতে বলা কঠিন। লণ্ডন যাবো বলে হেঁসেল তুলে ফেলেছিলাম, কাজেই এ ব্যবস্থায় খুশিই হলাম আমি।

"লণ্ডনে তিন মাস কাটিয়ে একদিন সন্ধ্যেবেলা ফিরে এলাম। স্যুটকেস ও ভারী ব্যাগটা দরজার সামনে রেখে একটু দম নিয়ে ঘন্টার বোতাম টিপলাম। দোতলার জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখলো রুক্মিণী, পরমুহূর্তে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এসে দরজা খুলে আমাকে

দু'হাতে জাপটে ধরে সে কি সম্বর্ধনা ! ব্যাগটা হাতে নিয়ে আবার উঠে গেল উপরে। আমি স্যুটকেসটাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে ক্লান্ত ভারী পায়ে অনুসরণ করলাম। রুক্মিণী ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি কফি পারকোলেটরে জল চাপালো। ফায়ারপ্লেসের পাশে গদীআঁটা চেয়ারে বসে তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিলাম। অন্য চেয়ারটায় বসা পীটার পেরেরা আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হাসলো। রুক্মিণী কল কল করে কথা বলে চলেছে। ওর অদ্ভুত একটা পরিবর্তন এসে গেছে এই ক'মাসে। কারণটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হল না। শুধু উল্লসিতই হলাম না, বেশ একটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করলাম।

মনে মনে বললাম, 'এইবার পথে এসো বাবা। ভাগ্যের জব্বর রগড় চাখবে এতদিনে।'

"ভেবেছিলাম এইবার একটু একটু করে আলগা হবে আমাদের বন্ধুত্ব, ওর খবরদারীর হাত থেকে রেহাই পাবো। ওদের দু'জনের ব্যক্তিগত পৃথিবীতে আমার ভূমিকা হিতৈষী শুভানুধ্যায়ীর হলেও, আমি একান্তই বাইরের লোক এখন। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু উল্টোটাই হল। ওদের জীবনের সঙ্গে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম আমি। পীটারের সঙ্গে নতুন করে সম্বন্ধ স্থাপন হল রুক্মিণীর তাঙ্গাচ্চি অর্থাৎ ছোট বোন রূপে। এতদিন একজনের রক্ষণাবেক্ষণে অতিষ্ঠ হচ্ছিলাম, এবার জোড়া গার্জেন চাপলো ঘাড়ে। মাঝে মাঝে রাগ হত আমার। লোকে প্রেমে পড়লে নিড়িবিলি খোঁজে। এদের প্রেম তো নয়, যেন পুরোদস্তুর ঘর-সংসার। ওই একখানা ক্ষুদে ঘরে সাড়ম্বরে রান্নাবান্না শুরু হল ষোড়শোপচারে। জিভে জল আসা নানা রকম নতুন সুখাদ্যের সঙ্গে দ্রুত পরিচয় ঘটতে লাগলো। দেখলাম পীটারও কিছু কম যায় না এ ব্যাপারে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে বাইরের প্রোগ্রাম তো আছেই। ঘরে বাইরে সর্বত্র চিরন্তন ব্যাকড্রপের মত উপস্থিত তাঙ্গাচ্চি - অর্থাৎ আমি। আমার কোন ওজর আপত্তিই শুনতো না ওরা।

"ইতিমধ্যে টমসন বুড়ি ভারী উপদ্রব আরম্ভ করলো। আগেই বলেছি মাথায় ছিট ছিল। তবু সহ্যের মধ্যে ছিল এতদিন, এইবার বাড়াবাড়ি শুরু করলো। একপাল বিড়াল ছিল বুড়ির, সেগুলোকে লেলিয়ে দিল। এর আগে অন্যান্য ইংরেজ পরিবারে যে ক'টা বিড়াল দেখেছি সেগুলো বেশ সভ্য-ভব্য। ভাবতাম বুঝি ওদেশের আবহাওয়ার গুণ। কিন্তু এ

বিড়ালগুলো আমাদের দিশী বিড়ালের থেকেও নিকৃষ্ট। আমরা না থাকলে ঘরে ঢুকে খাবার খেয়ে ফেলতো, কুশন-পর্দা ছিঁড়তো। অবশ্য শেষের ব্যাপারটার জন্যে মাথাব্যথা ছিল না আমাদের। ভাবতাম বিড়ালও বুড়ির, পর্দা-কুশনও বুড়ির। ওর যদি আপত্তি না থাকে তো আমরা নাক গলাবার কে?

"কিন্তু সেদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। রাত্রে সিনেমা দেখে ফিরে তিনজনে রুক্মিণীর রুমে ডিনারের তোড়জোড় করছি। পোর্ক চপগুলো গ্রীলে দিয়ে গ্যাস জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে এক উৎকট গন্ধে ঘর ভরে গেল। টমসনের মার্জারিনী আমাদের অনুপস্থিতিতে কখন অপকর্ম করে গেছে ওখানে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে হুড়মুড় করে বাইরে চলে এলাম আমরা। পীটার ওরই মধ্যে কোন রকমে গ্যাসটা নিভিয়ে এলো। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়েও সেই বিকট গন্ধে সারা বাড়ি ভরপুর। আমার ঘরে এক প্যাকেট কর্নফ্লেক্স ও খানিকটা দুধ ছিল। তাই দিয়ে কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ল। রুক্মিণীকে আমার ঘরেই শুতে হল সে রাতটা।

"সকালে উঠে মিসেস টমসনকে নালিশ জানাতে উল্টে ও-ই রুক্মিণীকে তেড়েফুঁড়ে এলো। বিড়ালগুলো নাকি ওর পেটের সন্তানতুল্য এবং এমন বিড়াল আর হয় না (এ কথা আমরাও মনে মনে স্বীকার করলাম)। বুড়ির রাগের কারণ হল পীটার। ও কেন রোজ সারাসন্ধ্যে এ বাড়িতে কাটায়।

রুক্মিণী বললো, 'তাতে তোমার কি? তোমার সব ভাড়াটেরই তো বন্ধু-বান্ধব আসে।'

বুড়ি বললো, 'সে হল অন্য জিনিস।'

তারপর আমার দিকে চশমা তুলে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের সুরে বললো, 'ওই যে মিস মুখার্জী। ওর কত নতুন নতুন বন্ধু আসে রোজ। আমি এতটুকু মাইণ্ড করি না। কিন্তু তোমার ফ্রেণ্ড দেখি এখানেই পড়ে থাকে সর্বক্ষণ। একাধিক লোকের আনাগোনা মানেই সব ঠিক আছে, মাত্তর একজন হলেই গড়বড়।'

"রাগে অপমানে রুক্মিণীর চোখে জল এসে গেল। ও আর কিছু না

বলে গট গট করে নিজের ঘরে চলে এলো। পরদিনই ঘরভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল ও। পীটারের ল্যাণ্ডলেডী সব কথা শুনে রুক্মিণীকে ওদের বাড়তি ঘরখানা দিতে রাজী হয়েছে। ওদের পক্ষে খুবই ভাল হল ব্যবস্থাটা। তবু বিদায়কালে রুক্মিণীর দু'চোখ জলে ভরে এলো।

বললো, 'তোমাকে এই ডাইনীর কবলে রেখে যেতে একটুও ভাল লাগছে না স্বপ্না। ও বাড়িতে আর একখানা যদি ঘর থাকতো !'

আমি সে সম্ভাবনায় মনে মনে আঁতকে উঠে বললাম, 'কিছু ভেবো না। বুড়ি আমার করবেটা কি? তাছাড়া তোমরা তো অক্সফোর্ডেই থাকছো। আমি মাঝে মাঝে যাবো, আর লাইব্রেরীতে তো নিত্য দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

"রুক্মিণী বাড়ি বদলানোতে আমার খুশি হবার আরেকটা কারণও ছিল। আমি জানতাম ওখানে বেশ কিছু লোক আমাদের বন্ধুত্বটাকে বাঁকা চোখে দেখতো। এর ক'দিন আগেই লক্ষ্মীদি ইণ্ডিয়া সোসাইটির মিটিং'এ নিরীহ সুরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আজকাল আর আসোটাসো না। থিসিস নিয়ে খুব ব্যস্ত বুঝি?'

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে উনি খুক খুক করে হেসে বললেন, 'দিব্যি ভাইকেরিয়াস প্রেম চালিয়ে যাচ্ছ মাইরি, সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার !'

তপতী একমনে আমাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল। ছদ্ম সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে।

তারপর কেটে কেটে বললো, 'ইটারনাল ট্র্যাঙ্গেলের সল্যুশন খুঁজে বার করেছে স্বপ্না। ইউক্লিডের পরেই ওর নামটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।'

নিজের রুমে ফিরে আসার পরও ওদের বিদ্রূপ কানে যেন গরম সীসে ঢেলে দিচ্ছিল। আমি জানি ওরা কেন আমায় পছন্দ করে না। ওদের মত জোট বেঁধে থাকতে পারি না আমি। পুঁথিগত বিদ্যে দিয়ে যাচাই করি না মানুষকে। দেশ, ধর্ম ও রঙের স্ট্যাম্প বাদ দিয়ে শুধু মানুষটাই চোখে পড়ে প্রতিবার।

"আর একটা বছর কেটে গেল। রুক্মিণীর পড়া শেষ হল,

অক্সফোর্ডের মেয়াদও। আমি তখন লণ্ডনে। ছুটিতে যথারীতি ওখানকার লাইব্রেরীগুলো হাতড়ে বেড়াচ্ছি। বিদায়ের ক'দিন আগে ওরা দু'জন লণ্ডনে এলো, ওখান থেকেই প্লেন ধরবে রুক্মিণী। আমরা তিনজনে এখানে ওখানে ঘুরলাম। আসন্ন বিচ্ছেদের বিষন্নতা ঘিরে ধরেছিল সবাইকে।

রুক্মিণীকে কাঁদতে দেখে বললাম, 'পীটারও তো ক'মাস পরেই যাচ্ছে। তারপর দু'জনে মিলে হানিমুন করতে ইণ্ডিয়ায় এসো। কথা দিচ্ছি তখন আর আঠার মত লেপ্টে থাকবো না।'

ও আমাকে বুকে টেনে নিয়ে গালে চুমু দিলো।

তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'জানি না আমার কপালে কি আছে। কিন্তু অক্সফোর্ডের দিনগুলোর স্মৃতি বুকে করে রাখবো চিরদিন।'

"রুক্মিণী দেশে ফিরে গেল। লণ্ডনে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছিল। আমি ও পীটার একই সঙ্গে অক্সফোর্ডে ফিরলাম। আমারও শেষ বছর এটা। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবরা অনেকে পড়াশোনা শেষ করে চলে গেছে। অন্যদের আমারই মত পড়ার চাপে সময় নেই আর। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি লাইব্রেরী আর ডিগ্‌সের অপরিসর গণ্ডীতে। মিসেস টমসনের ডেরা ছেড়ে আমার বন্ধু এ্যানমেরীর পিসির বাড়ি উঠেছি। মিসেস হল্যাণ্ড নির্বিরোধী ভাল মানুষ। আমি ভাড়াটে হলেও ওর ভাইঝির বন্ধু হিসেবে বিশেষ সুখসুবিধা সম্মান ভোগ করি অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটেদের তুলনায়।

"আগে উইক-এণ্ডগুলোতে রুক্মিণী আমায় ওদের বাড়ি নিয়ে যেত। আগেই বলেছি টমসন বুড়ির বাড়ি ছাড়ার পর ও পীটার যে বাড়িতে থাকতো সে বাড়িতেই একটা ঘর নিয়েছিল। সে বাড়িতে মেয়ে পুরুষ আরও কয়েকটি ভাড়াটে ছিল, কাজেই রুক্মিণী ও পীটারের একই বাড়িতে থাকার কোনও কদর্থ করেনি কেউ। রুক্মিণী যাওয়ার পরও ওদের বাড়ি রবিবারের মজলিসটা জারি রইলো। রুক্মিণী স্থূল শরীরে অনুপস্থিত থাকলেও ওখানে গেলে ওর মমতা ভরা উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতাম আমি।

"রুক্মিণী যাওয়ার পর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। একটাও চিঠি পাইনি ওর। পীটারকে জিজ্ঞেস করলে বলতো ও পেয়েছে, রুক্মিণী ভাল আছে এবং আমায় ভালবাসা জানিয়েছে। ওর সংক্ষিপ্ত উত্তরে মনে হত, ও চায় না আমি রুক্মিণীর চিঠির বিষয়ে আরও জেরা করি। অথচ রুক্মিণী যতদিন ছিল, আমি ওদের এড়াতে চাইলেও ওরাই জোর করে টেনে আনতো। অনেক সময় মনে হত, আমার উপস্থিতি কখনোই ওদের কাম্য হতে পারে না। আমি তো তৃতীয় ব্যক্তি, উর্দুতে যাকে বলে 'কাবাব মে হাড্ডি'।

রুক্মিণীক বললে বলতো, 'দুর পাগলি, তুমি আমাদের তাঙ্গাচ্চি। তুমি কাছে থাকলে মনে হয় এ আমাদের রীতিমত পাকাপোক্ত ঘরসংসার, অন্যদের মত দু'দিনের রোমান্স নয়। জানো, পীটারও তাই বলে।'

"আমিও তাই মেনে নিয়েছিলাম। পীটারের ব্যবহারে তাই ক্ষুন্ন হতাম। অথচ রবিবার সকালবেলা ও-ই এসে হাজির হত, আমায় নিয়ে যেতো ওদের বাড়ি সিংহলী লাঞ্চ খেতে, কখনো বা সিনেমায়, রেস্টুরেন্টে। অথচ আগেকার সেই খোলামেলা ব্যবহারে কোথায় যেন চিড় ধরেছে। ও প্রায়ই আনমনা, গম্ভীর হয়ে থাকতো।

"একদিন মনের ক্ষোভটা প্রকাশ করে ফেললাম, 'রুক্মিণী মুখেই তাঙ্গাচ্চি তাঙ্গাচ্চি করতো। দেশে গিয়ে সত্যিকারের তাঙ্গাচ্চিকে পাওয়া মাত্র বেমালুম ভুলে গেল আমায়। দু'লাইন চিঠিও দিল না আর ----।'

পীটার চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'তুমি ওর উপর অবিচার করছো স্বপ্না। ও সত্যিই তোমায় আন্তরিক স্নেহ করে। দেশে ফিরেও ভোলেনি তোমায়, কারণ পৃথিবীতে তুমিই এখন ওর একমাত্র তাঙ্গাচ্চি।'

প্রতিবাদ করে বললাম, 'তা কেন? ওর ছোট বোন আছে, তার নাম মৈথিলি। রুক্মিণী বলতো আমি নাকি তার মতো ----।'

পীটার বললো, 'হ্যাঁ। তোমার মধ্যে ও মৈথিলিকে খুঁজে পেয়েছিল। সেও নাকি তোমারই মত সৃষ্টিছাড়া, সাহসী আর জেদী ছিল। যা ন্যায্য মনে করতো তা থেকে কেউ টলাতে পারতো না তাকে, আর যা অন্যায় মনে করতো প্রাণ দিয়েও প্রতিবাদ করতো তার ----।'

পীটার একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো, 'অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছে মৈথিলি।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ। মৈথিলি মারা গেছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে। গুরুজনদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাদের অন্যায়ের শাস্তি নিজের মাথায় তুলে নিয়ে। অতি শোচনীয় ভাবে।'

"দূরে আইসিস নদী নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের কলোচ্ছ্বাস থেমে গেছে অনেকক্ষণ। রাজহাঁসগুলোকেও দেখা যায় না আর। টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিল পীটার। সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্প জ্বাললো। নির্বাক বিস্ময়ে শুনে গেলাম সেই অচেনা অদেখা অভিমানী মেয়ের কথা, যার সঙ্গে আমার নাকি আশ্চর্য মিল। কাহিনীটা রুক্মিণী নিজে কেন আমাকে বলেনি তার কারণ খানিকটা বুঝলাম, কিন্তু ওর ছোট বোন যে বেঁচে নেই সেটুকু তো বলতে পারতো? তবে কি আমার সঙ্গে মৈথিলির সাদৃশ্য এতই বেশী যে আমায় কাছে পেয়ে বোনের মৃত্যুর ঘটনাটাও মিথ্যে বলে ভ্রম হত তার?

"রুক্মিণীদের পরিবার তাদের তল্লাটে জমিজমা ধনসম্পত্তি মানসম্মান সবদিক থেকেই অগ্রগণ্য। গোঁড়ামীতেও। যুগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাইরের খোলসটাই পাল্টেছে শুধু - ভিতরে ভিতরে মান্ধাতার আমলের সংস্কার ও সংকীর্ণতা বজায় আছে আজও। বাড়ির মেয়েরা কলেজে যায়, ফ্যাশন করে কিন্তু অভিভাবকদের কড়াকড়িতে ঢিলে পড়েনি একচুলও। রুক্মিণী কলেজের পড়া শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে সবে, হস্টেলে থাকে। মৈথিলি কলেজে পড়ে। ওদের বাড়ি থেকে কলেজ মাইল খানেক দূর, গাড়িতে আসা যাওয়া করে। কো-এডুকেশন কলেজ। ওর বাবা একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক কলেজটার।

"ওদের ইংলিশের অধ্যাপক ছিলেন বিজয়বর্ধন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস। মৃতদার। দু'টি ছেলে আছে। একটু কবি কবি, আত্মভোলা, রোমান্টিক টাইপের লোক। সাহিত্য পড়াতে পড়াতে স্থান-কাল জ্ঞান থাকে না প্রায়ই। পানদোষও ছিল। হঠাৎ মৈথিলির বাবার কাছে কানাঘুষো খবর এলো যে বিজয়বর্ধন নাকি মৈথিলির প্রতি অনুরক্ত এবং

ওকে অর্ধাঙ্গিনী করার বাসনার কথা দু'একজন সহকর্মীর কাছে বলেছে। সত্যিই বিজয়বর্ধনের একথা বলার মত দুর্বুদ্ধি হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলেও সেটা সুরাদেবীর কৃপায় কিনা, সে তথ্য বাইরে প্রকাশ পায়নি কোনদিন।

"বিজয়বর্ধন দক্ষিণ সিংহলের রত্নপুরার লোক, এ অঞ্চলের হালচাল জানতো না ভালমতো। তাছাড়া লোকটা এমনিতেই একটু কাছা ঢিলে মত। সবকিছু তলিয়ে ভেবে দেখেনি। হঠাৎ যখন ম্যানেজিং কমিটি থেকে তলব পড়লো এবং প্রায় এক কথায় একটি সম্পুর্ণ বানানো না হলেও অতিরঞ্জিত অভিযোগে বরখাস্ত হল, মাথায় যেন বাজ পড়লো তার। কিশোরী মৈথিলি ওর চোখে যদি রঙ ধরিয়েও থেকে থাকে, তা ছুটে গেল অবিলম্বে। গৃহিণীহীন ছন্নছাড়া সংসারের বেহিসাব অপচয় অথবা নিজের বিলাসব্যসন যার দরুনই হোক, সঞ্চয়ের খাতা শূন্য। চাকরি খুইয়ে ছেলে দু'টিকে নিয়ে রাতারাতি পথে বসলো লোকটা। জনে জনে ম্যানেজিং কমিটির প্রত্যেকটি মেম্বারের পা জড়িয়ে ধরলো কিন্তু কোন ফল হল না।

"মৈথিলির কানে যখন কথাটা পৌঁছলো বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল সে। শুধু ব্যাপারটার অভাবনীয়তাতেই নয়, গতিপথেও। বিজয়বর্ধনের ব্যবহারে কোনদিন কোন অশোভনতা চোখে পড়েনি মৈথিলির, কাজেই যদি তার সম্বন্ধে মনে মনে লোকটার কোন দুর্বলতা থেকেও থাকে, সেটা মৈথিলির মতে তার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। যদিও বিজয়বর্ধনের তার প্রতি দুর্বলতা আছে এ কথা ভাবতে ভাল লাগেনি তার। মৈথিলি বরাবরই একটু দুরন্ত টাইপের মেয়ে। উনিশ বছর বয়সে লেখাপড়া, খেলাধুলো নিয়েই তার জগৎ। বিয়েথাওয়া ঘরসংসারের চিন্তা একেবারেই অপ্রীতিকর তখন। বিশেষতঃ একজন মধ্যবয়সী সম্মানার্হ অধ্যাপককে জড়িয়ে এ চিন্তা রীতিমত বেদনাদায়ক তার পক্ষে।

"ঠিক এই কথাই বাবাকে বলেছিল সে। আরও বলেছিল যে ব্যাপারটা হয়তো পুরোটাই কানাঘুষো। আর বিজয়বর্ধন যদি সত্যিই একথা কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলেও থাকে, তার জন্যে এত বিচলিত হবার কি আছে? বিজয়বর্ধনের অপরাধ অতি তুচ্ছ, যদি একে আদৌ অপরাধ বলে ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে লোকটার উপর এত বড় অন্যায়

জুলুম কেন হবে? এ ব্যাপারে তার বাবার ভূমিকা সম্বন্ধে মৈথিলির সন্দেহের অবকাশ মাত্র ছিল না। তাঁকে সে অনুরোধ করলো অবিলম্বে বিজয়বর্ধনকে তার চাকরি ফিরিয়ে দিতে। আর মেয়ের সম্বন্ধে উনি যদি এতই সেনসিটিভ, মৈথিলি বরং এ কলেজ ছেড়ে মেয়েদের কলেজে হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করবে। এতে কিন্তু ফল হল বিপরীত। বাবা ভাবলেন মেয়ের তরফ থেকেও নির্ঘাত দুর্বলতা আছে, নইলে লোকটার প্রতি এত দরদ হবে কেন? বিজয়বর্ধনের উপর চাপ দেওয়া হল যে সে যেন অবিলম্বে ওখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ওখান থেকে চলে গেল সে। বাবা নিজের মেয়েকে চিনতেন না, তাই নিশ্চিন্ত হলেন নিষ্কন্টক হয়েছেন ভেবে।

"এরপর হঠাৎ মৈথিলি নিখোঁজ হয়ে গেল। কয়েক মাস পর যখন তার হদিস পাওয়া গেল, সে তখন বিজয়বর্ধনের বিবাহিতা স্ত্রী। বিজয়বর্ধন দারিদ্র্যের শেষ ধাপে নেমেছে তখন। একটা দোকানে সেলসম্যানের কাজ নিয়েছে, যৎ সামান্য মাইনে। আগের কলেজে যা দুর্নাম অর্জন করেছে, তার ফলে অন্য কোথাও অধ্যাপকের চাকরি আর জোটেনি তার। মৈথিলি বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে কিংবা তাদের সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখতে অস্বীকার করে। শুধু রুক্মিণী একবার দেখা করতে পেরেছিল। সে ছবি চিরদিনের মত আঁকা আছে তার মনে। তার অত আদরের বোন মলিন জীর্ণ বিছানায় পড়ে রয়েছে। অনাহারে অযত্নে কঙ্কালসার চেহারা। রুক্ষ মলিন দু'টো ছেলে ঘরের এক কোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত বিজয়বর্ধন রাজ্যের হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরলো। অনেক চেষ্টা করেও কিছু টাকা জোটাতে পারেনি সে। রুক্মিণী অনেক কাঁদলো, মিনতি করলো, কিন্তু মৈথিলি ওর সাহায্য গ্রহণ করতে রাজী হল না কিছুতেই। তার বাবার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করছে সে, প্রায়শ্চিত্তটা ভাল ভাবেই হোক।

"বিজয়বর্ধন আড়ালে রুক্মিণীকে সব কথা বললো। ও জাফনা ছেড়ে আসার পর মৈথিলি কোথা থেকে ঠিকানা জোগাড় করে এক বস্ত্রে ওর ডেরায় এসে হাজির হয় এবং বিয়ের প্রস্তাব করে। বিজয়বর্ধন তখন প্রায় রাস্তার ফকির। দু'টি অপোগণ্ড শিশু নিয়ে উপার্জনের ধান্দায় দোরে দোরে ফিরছে। মৈথিলিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি ফেরানোর অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু মৈথিলি কিছুতেই জিদ ছাড়েনি। বারে বারে বলেছে যে বিনা

অপরাধে দণ্ড যখন পেয়েই গেছে বিজয়বর্ধন, তখন তথাকথিত অপরাধ করার অধিকারও অর্জন করেছে সে। শাস্তি মকুব করা না যাক, অন্ততঃ তার অন্যায়ত্বটা ঘুচুক। এমনি করে অভিমানী মেয়েটা স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিল। রুক্মিণী বোনকে আর দেখেনি। এর কয়েক মাস পরেই সন্তান প্রসবকালে মৃত্যু হল মৈথিলির ----।

"আমার আর পীটারের থিসিস প্রায় এক সঙ্গে শেষ হল। আমার 'ভাইবা'র তারিখ ওর 'ভাইবা'র দশ দিন পরে। দেশে ফেরার তোড়জোড় চলতে লাগল।

পীটার বললো, 'আমরা এসেছি এক জাহাজে, এক জাহাজেই ফেরা যাক।'

কিছু টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। ইচ্ছে ছিল মাস দুয়েক এদেশে একটু ঘুরে তারপর দেশে পাড়ি দেবো। এডিনবরা থেকে উমাদি অনেকবার চিঠি লিখেছে যাবার জন্যে, এ ছাড়া কলেজের বন্ধুরাও আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে।

"'ভাইবা'র ক'দিন পরের কথা। উলওয়ার্থ থেকে টুকিটাকি কেনাকাটা সেরে ফিরছি, দেখি সামনেই লক্ষ্মীদি আর তপতী। আমায় দেখে হাত নাড়লো, তারপর কাছে এসে একগাল হেসে পিঠ চাপড়ালো।

'সত্যি ভাই, ভারি আনন্দের কথা। লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে শেষ হল, দেশের মেয়ে দেশে ফিরবে এবার।'

তপতী একটু চিন্তিত ভাবে বললো, 'পেরেরা তাহলে ইণ্ডায়াতেই সেট্‌ল্ করবে? অবশ্য তাই করা উচিত। ওদের তো ম্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি।'

লক্ষ্মীদি সংশোধন করলেন, 'সে তো মালয়ালিরা। পেরেরা সিংহলী।'

আমায় হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে পিঠে আর এক দফা চাপড় মেরে বললেন, 'হয়েছে, অত ন্যাকা সাজতে হবে না। আমাদের কাছে এতো লুকোচুরি করো কেন বল তো? বিদেশে এই ক'টি বাঙালী পড়ে আছি, অথচ এতটুকু ইউনিটি নেই।' প্যাকিং'এর দোহাই দিয়ে ওদের কাছ থেকে রেহাই পেলাম কোন মতে।

"ওদের কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো ক্রমাগত, অন্তর্নিহিত অর্থটাও। বিকেলে পীটার আসবে। প্লে হাউসে 'হেডা গেবলার' দেখতে যাব দু'জনে। সে কথা মনে হতেই আতঙ্কে ভরে উঠলো মন। মনে হল ওর সামনে গিয়ে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবো না আমি, অন্ততঃ আজ। বাস আমার স্টপ পেরিয়ে গেল, আমি নামলাম না। আরও অনেকগুলো স্টপ পেরিয়ে নর্থ প্যারেডে নেমে পড়লাম ব্রাউন পেপারের প্যাকেটগুলো নিয়ে। মিসেস ফ্লেচার আমায় দেখে খুব খুশি হলেন। আমি ক'দিন পরেই এখান থেকে চলে যাব শুনে আজ রাত্রে ওদের সঙ্গে ডিনার খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ওখানে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে রাত দশটায় বাড়ি ফিরলাম।

"ঘরে ঢুকে দেখি এ্যানমেরী চেয়ারে বসে ঢুলছে।

আমার সাড়া পেয়ে লাফিয়ে উঠলো, 'স্বপ্না, কি হয়েছে তোমার !'

অবাক হয়ে বললাম, 'কি আবার হবে? তুমি বার্মিংহাম থেকে কখন এলে?'

ও বললো, 'দুপুরে এসেছি।'

আমার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

তারপর বললো, 'থ্যাঙ্ক গড ! আমি ভেবেছি এ্যাক্সিডেন্টই হল বুঝি।'

আমি বললাম, 'হঠাৎ এ্যাক্সিডেন্ট হবে কোন দুঃখে?'

এ্যানমেরী এ্যাশট্রে ভর্তি সিগারেটের টুকরো দেখিয়ে বললো, 'তোমার বয়ফ্রেণ্ড বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ন'টা অবধি অপেক্ষা করে বসেছিল তোমার জন্যে। তুমি নাকি ওর সঙ্গে হেডা গেবলার দেখতে যাচ্ছিলে ছ'টার শো'তে। তারপর র‍্যানডল্‌ফে তোমার থিসিস সেলিব্রেট করার কথা ছিল।'

ফায়ার প্লেসের দিকে চেয়ে নির্লিপ্ত গলায় বললাম, 'এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আটকে পড়লাম। ওরা ডিনার না খাইয়ে ছাড়লো না।'

এ্যান বিস্মিত কন্ঠে বললো, 'যখন তুমি জানো তোমার বয়ফ্রেণ্ড টিকিট কেটে রেখেছে, ওর সঙ্গে ডিনার খাবে কথা দিয়েছ এবং ও তোমারই সাফল্য সেলিব্রেট করছে !'

আগুনের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে বললাম, 'তোমার ধারণা ভুল। ও অন্য কারও বয়ফ্রেণ্ড, আমার নয়।'

"এ্যানমেরী আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। একটা হাত আমার কাঁধে রেখে অন্য হাত দিয়ে থুতনি তুলে ধরে বললো, 'কি হয়েছে স্বপ্না? এ লাভার্স টিফ? আমায় বলো। আফটার অল আই অ্যাম ইয়োর ফ্রেণ্ড।'

বললাম, 'বলার কিছু নেই। ও আমার বয়ফ্রেণ্ড নয়, কোন কালেও ছিল না। কিন্তু সবার মুখে শুনে শুনে এখন নিজেরই ধোঁকা হচ্ছে।'

ওকে সংক্ষেপে বললাম রুক্মিণীর কথা।

বললাম, 'আমার ধারণা রুক্মিণী থাকতে আমরা তিনজনে একত্র ঘোরাঘুরি করতাম এবং আমি রুক্মিণীর বন্ধু, স্নেহাস্পদ, তাই পীটার আমার সঙ্গে রুক্মিণীর কথা বলে ওর অনুপস্থিতির যন্ত্রনা ভুলতে চায়।'

বলতে গিয়ে থমকে থামলাম। পীটার তো আমার সঙ্গে রুক্মিণীর কথা বলে না ! বহুদিন আগে রুক্মিণীর চিঠির বিষয় জিজ্ঞেস করে ওর সংক্ষিপ্ত উত্তরে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তারপর ওর কথা যেচে জিজ্ঞেস করিনি আর, পীটারও আর সে কথা বলেনি। তাহলে সপ্তাহান্তে এই যে সারাদিন এক সঙ্গে কাটানো - একত্রে সিনেমা দেখা, পিকনিকে যাওয়া - এর অর্থ কী?

"এ্যানমেরী আমার থমকে থামাটা লক্ষ্য করেনি।

আমার অসম্পূর্ণ কথাটাকেই সম্পুর্ণ ধরে নিয়ে ও তার জবাবে বলে চললো, 'কিন্তু স্বপ্না, আমার মনে হয় এ তা নয়। ও যদি রুক্মিণীর বিরহেই কাতর, তাহলে তোমার কাছে তার কথা না বলে, তাকেই লম্বা লম্বা চিঠি লিখতো সারাদিন ধরে ----। আমি তো ছুটিতে এলেই ছেলেটিকে দেখি, ও যে তোমায় ভালবাসে এতে এতটুকু সন্দেহ নেই আমার। কিছু মনে করো না। তুমিও বোধহয় ভালোবাসো ওকে। বন্ধুর প্রতি লয়াল্‌টি বোধের জন্যে সেই সত্যটা নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধছে। স্বপ্না, তোমার এ অপরাধবোধ একেবারেই অনাবশ্যক। লেট মী টেল ইউ, দ্য ফার্স্ট লভ্ ইজ রেয়ার্‌লি দ্য ট্রু লভ্।'

"পরদিন ভোরের ট্রেনে এ্যানমেরী বার্মিংহাম ফিরে যাবে। ভোর

পাঁচটায় আমার দরজায় টোকা দিল। আমার জিনিসপত্র সমস্ত প্যাক করে দরজার কাছে লাইন দিয়ে রেখেছি। সারা রাত জেগে প্যাক করেছি সেগুলো। মিসেস হল্যাণ্ড রাত্রিবাস পরে ঘুমচোখে ভাইঝিকে বিদায় জানাতে উঠেছে।

তার হাতে পাওনা টাকা গুঁজে দিয়ে বললাম, 'আমিও যাচ্ছি এ্যানের সঙ্গে।'

'সে কি, একেবারে চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, একেবারে ----।'

একই ট্যাক্সিতে স্টেশনে এলাম দু'জনে। এ্যান বার্মিংহামের টিকিট করলো, আমি এডিনবরার। উমাদির কাছে থাকবো কিছুদিন। তারপর ধীরে সুস্থে প্যাসেজ বুক করবো। এ্যান আমার গন্তব্যস্থান কাউকে জানাবে না। মিসেস হল্যাণ্ড জানলো ওর সঙ্গে গেছি আমি, কেউ খোঁজ করলে সেই কথাই বলবে ----।

"মাস দুয়েক পরে দেশে ফিরলাম। দেশে ফিরে এ্যানমেরীর চিঠি পেলাম। সেই সঙ্গে পীটারের চিঠি। এ্যান লিখেছে,

'প্রিয় স্বপ্না,

তোমার কথামত তোমার এডিনবরার ঠিকানা আমি কাউকে জানাইনি। পীটার পেরেরা ওর এই চিঠিটা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছে। এতদিনে তুমি বোধহয় দেশে পাড়ি দিয়েছ, ওখানকার ঠিকানাতেই পাঠালাম চিঠিটা।

আশা করি তুমি ভুল করোনি। আর যদি ভুল করে থাকো, তবে তা মেনে নেবার এবং শোধরাবার সাহস এবং সুযোগ ভগবান যেন তোমায় দেন, এই আমার প্রার্থনা। ভালবাসা নিও। চিঠি দিও।

তোমার এ্যান'

"পীটারের চিঠি

'স্বপ্না,

কেন যে তুমি এমন আকস্মিকভাবে চলে গেলে জানি না। আমার জীবনের একাধিক অকারণ বিপর্যয়ের মত তোমার হঠাৎ চলে যাওয়াটাকেও আমার ভাগ্য বলে মেনে নিলাম।

জানো তো, আমার জন্মদিন লিপ-ইয়ারে, ২৯শে ফেব্রুয়ারী। প্রতি বছর অনেক প্রত্যাশা নিয়ে একটা ছোট ছেলে তার জন্মদিনের পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে দিন গুনতো। পঁচিশে ফেব্রুয়ারী, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ - তারপর তাকে ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ মার্চ মাস এসে হাজির হত।

অনেক বছর কেটে গেছে, সে ছেলেটি বড় হয়ে গেছে এখন। তবু এখনও ঠিক সেই রকম যে লগ্নটি ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ চেয়ে দেখি কখন পার হয়ে গেছে তা। সময় হয়নি বলে যে কথা বলিনি এতদিন, আজ দেখলাম সে কথা বলার সময় ফুরিয়েছে চিরদিনের মত। ইট ইজ টু লেট নাউ। তাই সে কথা থাক।

মনে হচ্ছে এই চিঠিই তোমার সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ। তাই আর একটা কথা বলে দিই এখনই। মনে পড়ে, এক বছর আগে রুক্মিণীকে প্লেনে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম আমরা। রুক্মিণীর কথা এড়িয়ে যেতাম আমি, তুমিও ক্ষুব্ধ হয়ে জানতে চাওনি আর। দেশে ফিরে রুক্মিণী মাত্র একটা চিঠি দিয়েছিল আমায়, দেশে ফেরার দিন দশেক পর। লিখেছিল যে ওর মামার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা নাকি পাকা করে ফেলেছে ওর বাবা-মা এবং তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। এমন কি সে যে ইতিমধ্যে অন্য একজনকে বাগ্‌দান করে এসেছে, সে কথা মুখ ফুটে জানানোরও সাহস নেই তার।

লিখেছিল, 'আমায় তোমরা ভুলে যেও, এবং সম্ভব হলে ক্ষমা করো। জানি তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে। কিন্তু স্বপ্না কোনদিন আমার এ কাপুরুষতা ক্ষমা করবে না। জানো, মৈথিলির কথা বড় বেশী মনে পড়ে আজকাল। মৈথিলি বেঁচে থাকলে আজ ঘেন্নায় থুতু ফেলতো আমার উপর, স্বপ্নাও নিশ্চয়ই ঘৃণা করবে আমায়। ওকে পেয়ে আমার তাঙ্গাচ্চিকে ফিরে পেয়েছিলাম। আবার নতুন করে হারালাম তাকে।'

রুক্মিণীর চিঠি পড়ে অবাক হলাম নিজের অবাক না হওয়ায়। ও যে দুর্বল এবং গতানুগতিকের বিরুদ্ধে যাবার মত প্রকৃতি ওর নয়, সেটা যেন নিজের অবচেতনে বরাবরই জানতাম আমি। ক্ষমা করার প্রশ্নও ওঠে না তাই। প্রত্যেক মানুষ, সে যা ঠিক তাই। অন্যেরা যদি তাকে অন্য কিছু ভেবে নিয়ে তার কাছে তার স্বভাববিরোধী কিছু প্রত্যাশা করে এবং

হতাশ হয়, তবে সেটা তাদেরই বিচারের দোষ। স্বপ্না, আমার একটা অনুরোধ রাখবে? রুক্মিণীকে মাঝে মাঝে চিঠি দিও তুমি। ও যে তোমার স্নেহ হারায়নি, এটুকু জানলে অনেকখানি বল পাবে জীবনে। অপরাধবোধও থাকবে না আর।

আর কি লিখবো? তুমি যা শুনতে চাওনি বলে চলে গেলে (অন্ততঃ আমার তাই ধারণা), চিঠির অজুহাতে সে কথা লিখতে চাই না আর। সে লগ্ন পার হয়ে গেছে।

তোমার হতভাগ্য বন্ধু

পীটার'"